KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৭/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সৌরাংশু মুখার্জী (1, 2) / অভিজিৎ সরকার (1/4, 5)
Title : অত্বর (ATWAR)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1 2 1/4 5	Year of Publication : ১৩৭২ (প্রথম সংকলন) ১৩৭৩ (দ্বিতীয় সংকলন) ১৩৭৩ (শারদ ১৩৭৪ (পঞ্চম সংকলন) Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অত্বর পার্থ (1)(2) সৌরাংশু মুখার্জী, শুভঙ্কর ঘোষ (1/4) অভিজিৎ সরকার, শুভঙ্কর ঘোষ (5)	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

* অন্তরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নাম কবিতা
* কবিতার কোনো ব্যাকরণ নেই

অন্বয়

পঞ্চম সংকলন ১৩৭৪

তোমার সত্তায় জ্বলুক অগ্নিপ্রেম আশা প্রেরণা দেবার মশলা * * *
ফেলে আসা দিনগুলি আর কি ফেরাতে পারে উৎসবের প্রথম সকাল * * *
আর তুমি, দুই বুক, স্বাস্থ্য নিয়ে পেতে আছো জানু ! ! * * *
প্রত্যেকের অন্তরের নিভৃতে কিছু প্রবণতা থাকে * * *
জনশ্রুতি, কুকুরেরা দুর্দান্ত প্রেমিক * * *
'হে পবিত্র প্রেম তোমাকে বিস্বাদ লাগছে কেন ? * * *
নাপাম হয়ে ধনীকে গর্জেছি—বিপ্লব। * * *
পাখিটার নাম হতো দুঃখ ঘৃণা বা ভালবাসা * * *
মন না পেলেও সারাজীবন সুদূর থেকে দেখবো তোমায় দেখবো অনন্ত * * *
যেমন ভালোবাসে বেরঙের প্রজাপতি কৃষ্ণচূড়াকে। * * *
প্রত্যক্ষ কবিতার মত আমার চোখে ফুটছে দ্বাদশ সূর্যের আলো * * *
সামনে নিজেকে যুতে দিয়ে জুতিয়ে কবিতা লিখে যাবো, * * *
আর সন্ধ্যার শাঁখ যেন একটা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা জীবন। * * *
অতএব 'আঙুর, আঙুর' শব্দ একমাত্র মাঙ্গলিক এ গলিতে * * *
অন্ধকারে তুমি সিগন্যাল, আমি দু হাত বাড়িয়ে থাকি * * *

কবিতার নাম জীবনসর্বস্ব কথাশিল্প

একদিন গোধূলি সন্ধ্যায় সহ-সম্পাদক গৌরাঙ্গসুন্দর দত্ত উত্তেজিত অবস্থায় ৬৭/২ মহাত্মা গান্ধী রোডে, অন্তরের কার্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে, তখন বর্তমান সংকলনের ব্যাপারে অভিজিৎ সরকার শুভঙ্কর ঘোষ ও শ্যামসুন্দর দত্ত আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। গৌরাঙ্গকে কেহ কখনো ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই। অভিজিৎ বলিলেন, পঞ্চমে ডেরা গেড়েছ দেখছি! শ্যামসুন্দর শুধাইলেন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই তো! উদাসীন দত্ত-কবিকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া শুভঙ্কর ঘোষের ধৈর্য্য রহিল না। তিনিও ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে গৌরাঙ্গ প্রমুখাৎ সমস্ত শুনিয়া সেদিন যেটুকু মস্তিষ্কে হৃদয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সার বুঝিয়াছিলাম তাহার মর্মটুকু জানানো যাইতে পারে—

ইদানীং কালের ভুঁইফোঁড় কেতাবী কোনো তর্কবাগীশ অদ্ভুতাচার্য অতিরঞ্জিত চিত্তে অনুষ্টুপ ছন্দের স্বপক্ষে বলিতে গিয়া কবুল করিয়াছেন কবিতা একমাত্র অনুষ্টুপের আশীর্বাদ পাইলে যোগ্য বিবেচিত হইবে, অন্য কোনো নোতুন ছন্দে ও স্বচ্ছন্দে স্ফুরিত হইলে তাহা কবিতা নয়। ইহাও নাকি অদ্ভুতাচার্য মহাশয়ের 'উক্তি' (গৌরাঙ্গের মতে 'উপলব্ধি' নয়)—'শবদে শবদে বিয়া' দিলেই কবিতা কিংবা একটি শবদের সঙ্গে সঙ্গম করিলেও গোটা একটি কবিতার যৌনযন্ত্রণা উপভোগ করা যাইবে। অভিজিৎ সরকার কহিলেন, বাঁচিয়া থাকুন এইসব 'কব্‌তে' লিখিয়ে সমঝদার এবং ঝাড়ুদারবৃন্দ। শুভঙ্করও চুপ রহিলেন না। বলিলেন গাল দিয়া লাভ কি ভাই, জানোই তো একজন বিশিষ্ট কবি হলফ করিয়া বলিয়াছেন, একদল নাৎসীর সামনে মিঞা তানসেনের গান মাঠে মারা যাইত, এ বিষয়ে নিশ্চিত; ভাগ্যবশতঃ তানসেনের সে দুর্দশা ঘটে নাই। শ্যাম বাধা দিয়া বলিলেন কথাকে রসোত্তীর্ণ করিয়াই শিল্প: অন্তর জীবনবোধের সাহায্যে তাহাই করিতে চাহে। অভিজিৎ এই বলিয়া সেদিনকার মতন উপসংহার দিয়াছিলেন, দুষ্ট গরুর চাহিতে শূন্য গোয়াল ভালো, গঠনমূলক সমালোচনা ভিন্ন আঁস্তাকুড়ের মন্তব্য লইয়া কখনো মাথা ঘামাইব না॥

কুমার চক্রবর্তী

বিদায় নিয়েছে গতকাল

কালরাতে অবিশ্রাম লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে ঘরের ভিতর
কারা যেন দৃপ্ত পদক্ষেপে
রক্তিমচোখে শাসানি দিয়ে গেছে।
রক্তের অমিত হ্রেষা
আর
সঙ্গীনের তীব্র দংশনে
বারবার ছিঁড়ে গেছে মশারি আমার।
দুহাতে বাতাস ঠেলে
এক আকাশ বুক নিয়ে
কারা যেন অসম্ভব দাপাদাপি আর
প্রতিশোধের জ্বলন্ত নখর দিয়ে
ছিন্নভিন্ন করেছে; শেষ ভোরে
ক্লান্ত চোখে
কারা যেন বিদায় নিয়েছে গতকাল।

ভাল লাগে না

চতুর্দিক অন্ধকার, নিদ্রা আমার ভাল লাগে না
অস্পষ্ট চলাফেরা, অসহ্য এই সঙ্গীহারা
ভাঙ্গা চাঁদের গ্রহণ জাগে আমার বুকে শ্রাবণরাতে
সঙ্গীহারা ভাল লাগে না—
ভাল লাগে না নিশুথরাতে আরশোলার পদশব্দ
তুমিই প্রিয় আমার ছিলে আশ্বিনের সেই শেষবাতাসে
ঝিঁ ঝিঁ পোকার তালে তালে মরুভূমি হাট হাট খোলা চারিদিকে
হাহাকারে ধূসর পেঁচা তামিল লাগায় আকাশছেঁড়া রক্তপাতে
ভাল লাগে না প্রিয় তোমায় ছাড়া হাওয়ার রাতে
জীবনের এই হলুদ তটে॥

শ্যামসুন্দর দত্তের স্রোতশুদ্ধ কবিতাবলী

যেন সবই ভুলে আছো অবলীলায়

ইদানীং তোমাকে খুব উদাসীন লাগে, মাঝেমধ্যে তোমার চোখে
অহমিকার নীল প্রতিচ্ছায়া
এত অহমিকা কেন! এত বেশী অহমিকা ভালো নয়
যেন সবই ভুলে আছো অবলীলায়! এত ভুল!
উদাসীনতার কাছে তো খুব সমর্পিত হয়ে আছো
এদিকে যে বয়ে যায় উজ্জ্বল সময়.....

ওহে ঘোর উদাসীন, অহমিকা ভুলে যাও এখন
এমন পরমলগন হেলায় ফুরিয়ে গেলে, জীবনে পুনর্বার
পাবে না এই উচ্চকিত সবুজ শিহর, এমন নিবিড় আহ্বান···
শুনছ না, অবিরত করাঘাত তোমার দুয়ারে! যৌবনের রাজদূত
তোমার পদতলে শিরস্ত্রাণ নামিয়ে রেখে নতজানু
তবু এত অহমিকা কেন! সময় ফুরিয়ে গেলে বুকের ভিতর
ধূ ধূ করবে নিঃস্ব মন্দিরের মত শূন্যতা গাঢ়
তখনই মনে পড়বে, যাকে তোমার প্রয়োজন ছিল, সে এসেছিল কাছে
ডেকেছিল তোমায়, শেষে ফিরে গেছে একা নিরুচ্চার অভিমানে

ভুলস্বর্গ

ঘোর দিশাহীনতায় প্রহর ফুরিয়ে যায় ভুল খেলাচ্ছলে, সময় ফুরিয়ে গেলে
আমাদের খেলা শেষ হবে, এই জীবনের মত একেবারে শেষ হয়ে যাবে
যোগাযোগ হবে ম্লান কল্পিত ব্রীজের মতন, আমাদের এই পরিচয় হায়
বড় ক্ষণেকের তরে, ক্রমশই বিস্মরণ দুই তীরে দীর্ঘবাহু মেলে
ঢেকে দেবে অতিদূর দিগন্তের সীমা, উৎসব ফুরাবে তার আপন স্বভাবে।
আমাদের জানাশোনা যেন দুদণ্ডের তাঁবু ফেলা মাঠে, যেন শীতের বেলায়
অঘ্রাণের দূর গ্রামে নরম রোদ্দুরে ঘাসে চড়ুইভাতির আয়োজন
তারপর সন্ধ্যা হলে সংসার সাজানো খেলা মুছে উতরোল ট্রেনের ধোঁয়ায়
ভুলস্বর্গ থেকে ফেরা ধূসর শহরে, আমাদের যোগাযোগ সবি ভুল
খেলার মতন

আজও তো পাইনি কোনো দীপ্রপ্রতিশ্রুতি বুকভরা উৎসবের দিনে
কোমল শঙ্খের মত উন্মুখ স্তনের তাপ আজও তো পাইনি নির্জনে
মায়াবী বাসনা কাঁপে...বুকের ওপরে বুক, মুখে মুখ, বাহুডোর, অধরে অধর...
যেন ঝরে যায়, রাজহাঁসের ডানা, শাদাশূন্যতা ক্রমে গ্রাস করে ক্লান্ত চরাচর···
তবু কেন অন্তহীন কেঁপে উঠি একা! ঘাসের সবুজ রঙ দ্যুতি ভিজে গেলে
নিঃশ্বাসের স্রোতে, বুকের রক্তে কার অলৌকিক পদধ্বনি ছলচ্ছল
দোলা উত্তাল

সেকি শুধু মায়াজাল! বছরের গোনাদিন চলে যায় দ্রুত অবহেলে
ফেলে আসা দিনগুলি আর কি ফেরাতে পারে উৎসবের প্রথম সকাল
তবু রক্তে দোলা কেন! আমার এ বুকের রক্ত সেকি কৃষ্ণচূড়ার মত লাল!

যাবার সময়

জাহাজের বাঁশী বেজে উঠলে নির্দ্বিধায় প্রস্তুত করে নেবো নিজেকে
সময় ফুরিয়ে গেলে অর্থহীন হয়ে আসে সব পিছুটান
সময় ফুরিয়ে গেলে পুরাতন অধিকার দাবি করা বৃথা

কিসের প্রতি ছিল পক্ষপাত, মগ্ন প্রবণতা, কাকে ঘিরে গোপন বাসনা
অহরহ উদ্বেলিত করেছে এই বুক অন্তরালে
ভুলে যেতে হবে, ভুলে যাবো সন্ধ্যাবেলা ভ্রমণের কালে
মধ্যপথে কার কাছে পেয়েছি অবিচল প্রত্যাখ্যান মমতাবিহীন

ফিরে তো এসেছি সেই পথ থেকে, ক্রমশ ভুলে যাবো সেদিনের ব্যথা
ম্রিয়মান জ্যোৎস্নার মত সব সাধ নিরুত্তাপ হিম হয়ে যাবে
পশ্চাতে দুলে উঠবে অতিদূর ধূসর স্বপ্নভূমি, প্রিয় ঝাউবীথি
শুধু সম্মুখে নীলাভ জল, দৃষ্টি জুড়ে নিরুদ্দেশ নীল অন্তহীন
অপেক্ষমান জাহাজের বাঁশী যখনই উঠবে বেজে সময় সংকেতে
এই তীরভূমি ছেড়ে রুমাল দুলিয়ে দিয়ে, উদাসীন মেঘের মতন
সহসা নিঃশব্দেই একা চলে যাবো নিরুদ্দেশে

বুকের বাঁদিক অভিমানী

হৃদয় আমার শ্রাবণবেলায় মেঘের মত নিরুদ্দেশে
আপন মনে উধাও স্রোতে এমনি শুধু চলছে ভেসে

আকাশ জুড়ে তোমার চোখের করুণ ছায়া ছলোছলো
তবুও কেন এত আমায় তোমার অবহেলা, বলো !

আমার যেমন খেয়ালখুশি, জড়িয়ে নেবো তোমার সাথে
আমার করতলের ছায়া দুলবে তোমার নিবিড় হাতে
বুকের বাঁদিক অভিমানী, খেয়ালপনা এমনি আমার
পারলে তোমায় নিয়েই যাবো দেশ যেখানে হাসুহানার
দূরেই যদি থাকো তুমি, মিথ্যে এমন ঘর সাজানো
আমার কিসের ব্যথা, প্রিয়, তুমি জানো, তুমিই জানো।

আড়াল খুব গাঢ় হলে, মনে পড়ে

আড়াল খুব গাঢ় হলে কখনো বৃষ্টিপাতের কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে বাস স্টপেজ, টিনের শেডের নীচে অপ্রশস্ত পরিসর
মুখোমুখি ব্যাকুলতা, নত চোখ
আড়াল খুব গাঢ় হলে প্রতীক্ষার স্মৃতি মনে পড়ে, গোধূলি আকাশ জুড়ে
ঘাসের শিশিরের মত টলোমলো স্মৃতি, প্রতীক্ষার কষ্ট মনে পড়ে

কখনো অন্ধকারে হাওয়ার ভিতরে ভারী হাওয়া ঝরে পড়ে অতর্কিতে
চোখের অন্তরালে শব্দহীন রক্তক্ষরণের মত, কখনো
মধ্যরাতে সকরুণ জ্যোৎস্নাপাতে দুলে ওঠে নিসংগ দেবদারু বীথি
মধ্যরাতে আচম্বিতে ঢেউ ওঠে কৃষ্ণসমুদ্রের নিস্তরংগ বুকের গভীরে
কেঁপে ওঠে ছায়াচ্ছন্ন দৃশ্য···সৈকতে সূর্যস্নান, আবিষ্ট শীতের রোদ্দুরে
উচ্চকিত পিকনিক, সূর্যাস্ত বেলায় স্টেশনের ওভারব্রীজে পদশব্দ···
অতঃপর 'এই আসছি' বলে কে যেন আমায় প্রতীক্ষায় রেখে যায় পথের ওপর
তারপর দৃষ্টিজুড়ে ক্রমশ আড়াল, ক্রমশই শূন্যতা, শুধু স্মৃতিলিপ্ত ধূ ধূ বৃষ্টিপাত

প্রিয় আমার, এবার সময় হলো

এরকম অনির্দেশ্য ঘুরে ঘুরে অবিরাম ঘূর্ণি আমার আর ভালো লাগে না
প্রিয় আমার, এবার তুমি বলো সুস্থ ঘর সংসারের কথা
বলো, সময় হলো গৃহস্থালী বাঁধার, সময় হলো, এবার সময় হলো

চৈত্র হাওয়ায় ঝড়ের আভাস চতুর্দিকে, দিগন্তের ঐ হরিদ্রাভ রঙে
নিগূঢ় সর্বনাশের রেখা
উদাস গোধূলীবেলায় ক্রন্দন হলো গাঢ়, ঝরে গেল কত ঝরাপাতা
হলুদের স্রোত, ভ্রান্ত অহমিকা
বিপুল ঝড় ঘনিয়ে এলো চৈত্র হাওয়ায়, ভুবন জুড়ে ঝড়, শুধু ঝড়
প্রিয় আমার, এবার তুমি বলো সুস্থ ঘরসংসারের কথা
বলো, এবার অংগীকারের প্রয়োজন কাছাকাছি থাকার জন্যে, নিঃশর্ত
সমর্পণের জন্যে, নিবিড় রাতে আত্মদান, অবিচ্ছেদ্য বাহুডোরে বেঁধে
উত্তপ্ত চুম্বনের জন্যে
এসো শিশিরে গোলাপ ধুয়ে বিছানার কাছে রাখো, খুব কাছে
নির্মল আঘ্রাণ পেলে গোলাপ বাগানের স্পর্শ আমাদের বুকে
তোমার অধর জুড়ে গোলাপের গাঢ় সৌরভ
এসো, আমাকে চুম্বন দাও প্রিয়

এরকম দিকহীন নিরুদ্দেশে ভেসে যাওয়া উধাও হাওয়ার মত
এখন ভীষণ ক্লান্তি নামায় ভিতরে ভিতরে
এরকম অনির্দেশ্য ঘুরে ঘুরে অবিরাম ঘূর্ণি আমার আর ভালো লাগে না
প্রিয় আমার, এবার তুমি বলো সুস্থ ঘরসংসারের কথা
বলো, স্থিতির মধ্যেই জীবন আছে, সেই জীবনের বড় প্রয়োজন এবার
তোমার আমার

কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

সমাধান

বাইরে থেকে খড় এনে গাছের কোটরে আমি আর বাসা বাঁধবো না
নিজের জন্যে,
আমি সারাদিন আকাশের পাখী হবো।
জেনেছি, ও এবং ওরা সবাই নিষ্প্রাণ, অর্ধমৃতের মত
তবে কেন এ কোটরে বাসা বেঁধে
উজ্জ্বল এক তারাকে বৃথা বন্দী করে রাখা !

নির্জনতা ছাড়া আর সব কিছুই তো বিষাক্ত
তাই, আমি সারাদিন আকাশের পাখী হবো
ওদের বাসা বাঁধবার সমস্ত খড় এনে দিয়ে
না হয় আমি কোনো উজ্জ্বল তারা হবো।

যাযাবর মন

'হে পবিত্র প্রেম তোমাকে বিস্বাদ লাগছে কেন'
ফিসফিস করে ওঠে নিশীথ রাত
ঘরের হাওয়া অসুস্থ যখন
তখন যেখানে সেখানে হৃদয় রাখা কেন।
(যেহেতু) এখনও নিশীথ রাত অপেক্ষা করে শিশির ঝরার
(যেহেতু) এখনও ঘরের হাওয়া স্পর্শ খোঁজে পবিত্র সুরার
(যেহেতু) ফাল্গুন সন্ধ্যার প্রত্যাশা প্রত্যেক মানুষ মানুষীর
সেহেতু আমিও যে কোন একজন।
'তবুও হে পবিত্র প্রেম তোমাকে বিস্বাদ লাগে কেন'।
অনেক তারার মাঝে হৃদয় চঞ্চল
অমিল পয়ার হয়ে সে প্রেম অচল,
'অনেক পাত্রের জল ক্রমান্বয়ে পান করে অতঃপর একদিন
হৃদয় বাঁধানো যায়' অভিজ্ঞ ভিখারী বলে।
আসলে এখানে নরম পাখীর মাংস কোনোদিনই চাই না
এখানে বাসরঘরের অন্ধকারে স্বপ্নও দেখি না,
শুধু কোনো গুমোট বাতাসের দিনে বহুদূর থেকে ভেসে আসা
এক উদাসীন সংগীতের সুর
প্রত্যাশা করি, আর কিছু
অসঙ্কিত অমৃত বিনিময়।
হে পবিত্র প্রেম, বিদায় এখন
নূতন তীরের স্বপ্নে বিহ্বল এ মন।

শুভঙ্কর ঘোষ

ভালোবাসা, তুমি সামগ্রিক নারী

তুমিও জেনেছ তবে ভালোবাসা একান্ত উদাসী
ভালোবাসা গ্রীসের সাম্রাজ্য নয়
নক্ষত্রের আলো জ্বলে বুকের ভেতর.
নিরন্তর
বুকের ভেতর সে কী তুমি!—বুকের ভেতর তুমি আছো কি-না
হুলুস্থুলু স্পর্শের বিভায়, স্মৃতি-জলপিপি দিবানিশি রোরুদ্যমানা
কোনোদিনই হিসাব কষি নি—আজো কষি না ;
শুধু জানি, আমারই আমন্ত্রণে বাজাবে বীণা—বাজাবে হৃদয়বীণা।
—এভাবেই সেই মুগ্ধ অনুভূতি
জীবনের যৌবনের স্ফূর্তি
যথেচ্ছ নেশায় তুমি কাছে এলে
আমার নিথিলে
জেগে ওঠে প্রকৃতির সুচারু রসের নেশা—ভালোবাসা জাগে ;
ভালোবাসা মানে না বন্ধন—মানে না সে ভয়
মনে নেই, সেই কবে, অস্পষ্ট ধূসর, সেই কবে
তুমিও জেনেছ তবে
ভালোবাসা গ্রীসের সাম্রাজ্য নয়
ভালোবাসা গ্রীসের সাম্রাজ্য নয়।
তবু তুমি আলোর ফসল—মেধাবী হৃদয়—তোমার অনন্ত মেধাবী হৃদয়
শুধু কি আকাশলীনা,
শুধু সুরঞ্জনা,
শুধু বনলতা সেন! এও কী সম্ভব হয়?
ভালোবাসা সর্বার্থসাধক, ক্ষুদ্র নয়।
বিনা রক্তপাতে তার অনন্ত বিপ্লব, চিরন্তন ;
ভালোবাসা মানে না বন্ধন
অথচ হৃদয়ের রাখী নিয়ে হরিদ্রাভ প্রত্যয়

মুক্তির বন্ধনে হাসে, মুক্তির বন্ধনে নিত্য পুরোহিত, ভালোবাসা দীপ্ত করবীর
ব্যাপক গভীর
রক্তবর্ণ হাসি ;
ভালোবাসা অমল আনন্দে অভিভূত ; তবু তো একান্ত উদাসী।
তুমিও জেনেছ তবে, ভালোবাসা বাঁধে ঘর, অথচ সে উতরোল
আরবের ঘোড়া। অথচ সে আমার ব্যথার নিঃশব্দ বাতায়ন।
গৃহস্থ আকাশে ভালোবাসা বাউল মেঘমালা। এবং প্রণত দীপ্তি।
অথচ সে আমার হৃদয়ে হাসে—কাঁদে—কখনো দাপায়—নাচে ;
ঘর বাঁধে ঘর ভাঙে
ঘর ভাঙে
ঘর বাঁধে,—তবু সে আমারই—তবু সে আমারই—সে আমার ভালোবাসা
কিংবা তুমি।
তুমিও ভেবেছ তবে, তুমি গান, তুমি হৃদয় দোলানো গান।
আমার গৃহস্থ আকাশে তুমি বাউল মেঘমালা ; ময়ূরী বৃষ্টির অভিমান,—
তুমি ভালোবাসা। ভালোবাসা শূন্যতার ছায়াছবি, দূর বালুচর অঙ্গীকার।
তুমি ভালোবাসা। ভালোবাসা, অসহ্য বিষাদের অসহ্য সুখের ভেতর
দীর্ঘ পথে মগ্ন আহ্বান, তুমি মগ্ন আহ্বান।
বসন্ত-বাতাসে তুমি পঞ্চশর।
তুমি ব্যথাভরা প্রেম। তুমি আমার নিখিলে মুক্ত পাখি।
রক্তের ভেতর স্নায়ুর চাঞ্চল্য, তুমি আমার বিভ্রম, বিচ্ছেদ আমারই,—
প্রিয়তমা, কি ভাবে তোমায় বেঁধে রাখি ?
ভালোবাসা মানে না বন্ধন, তবু তারে ডাকি ;
ডাকি এই হৃদয়েই ; মুক্তির বন্ধনে নিত্য পুরোহিত—তুমি অনন্ত আমারই ;
ভালোবাসা তুমি সম্রাজ্ঞী, তুমি দ্রৌপদী, লাঞ্ছনায় গরিয়সী, তুমি নারী
তুমি আমার সারাজীবনের চিত্রশিল্প, বসন্তের পাখি, অসুখ ও সুখের দিনে
স্ফুরিত হৃদয়-বীণে
তুমি সামগ্রিক নারী—ভালোবাসা, তুমি আমারই—তুমি আমারই।

স্বর্ণেন্দু দত্ত

আত্মহত্যা অথবা :

এক পা দু'পা করে
আকাশটাকে মুঠোর মধ্যে ধরতে গেলাম
আর
তেরোতলার ওপর থেকে নীচে...
পড়তে পড়তে ভাবলাম
আকাশের নীল অন্ধকারে হলুদ পাখীর ডানা।

থানা থেকে এল ক'জন নির্বোধ
বললে, 'আত্মহত্যা'।
তেরোতলার ওপর থেকে ঝুঁকে দেখল নীচে
ক'জন ঈশ্বর
রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড দেখে
অবজ্ঞাতে ঠোঁট উল্টোল ওরা
—'ফ্যাশান'!

মর্গের বীভৎস অন্ধকারে
শুয়ে শুয়ে আমি স্বপ্ন দেখলাম
একতলার পৃথিবীর ক্লিন্ন চিতাশয্যায়
আস্তে আস্তে পুড়ে যাচ্ছে···পুড়ে যাচ্ছে ক্রমে
আকাশের নীল শাড়ির প্রান্ত—সবুজরঙা পাড়।

রামচন্দ্র বসু

প্রাণপণে চলে আসি

সুদূরে কোথায় কখন বেজেছে বাঁশি
যতবার বলি প্রাণপণে চলে আসি
তবুও এখানে প্রত্যহ হাত ধরে
অসার অনাম নিয়তই সঞ্চরে

বুকের গভীর একান্ত কাছাকাছি
এরকম-ই করে বাঁচি।
দূরে শুয়ে থাকে আকাশ পাইন বনে,
এখানে এখন কার মুখ পড়ে মনে
কেবল এখানে প্রধান জরদ্গব
রোজ ভোরে রাখে দরজায় কিছু শব
নিহত শব্দ নিহত শব্দ করুণ দর্শনীয়।
নির্জন রাতে তাই স্তব্ধতা প্রিয়
মনে আনে দূরে কোথায় বেজেছে বাঁশি
প্রাণপণে বলি—
এই আসি, চলে আসি॥

উইলিয়াম মণ্ডল

এখন সবাই মৃত

'হতভাগ্য দেবদাস মরিল' রূপদক্ষ শিল্পীর আত্ম-দাহ গল্পচ্ছলে গঞ্জনা দেয় আমাকে; আমি এড়িয়ে যাওয়া আত্মীয়ের মতো আত্মকষ্টে নিমগ্ন। ঘুম নেই। রাতের পাখিরা ডানা ঝাপটায় কখন উঠবে তুমি—হে অনাদি সূর্য? আমি পারুকে খুঁজেছি—বলেছে সবাই যত্নে আছে দুঃখে নেই আমি মানি না সে কথা। পারুরা পরী নয়, দেবীও নয় আমাদের পাড়া-পড়শি; 'হতভাগ্য দেবদাস মরিল' পারুরা মরেছে তারও আগে।

গৌতম দাশগুপ্ত

শেষ

ঘরের ভিতর ওষুধ ভরা ঘ্রাণ
তিরিশটা দিন হয়নি ভালো স্নান
পাশের ঘরে স্টাফের হাসির রেশ
দুদিন পরেই শ্রমের হবে শেষ
দ্বি অক্ষরের শব্দ অনিমেষ
শুনেই শ্বাসে দিয়ে আঙুল চলল ঘুমের দেশ।

হরিপদ রায়

তোমার কথা উদ্ভিদ

তোমাকে আমি বলেছিলাম : হৃদয় বড়ো বিরক্তিকর
তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিই,
আমরা বরং কাঠের পুতুল হবো
ভুলতে চাইলেই ভোলা যায় না; পাখিরা
নীড়ের গন্ধ ঠিক বোঝে;
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়
ঠুঁটো জগন্নাথ ছিলো কবে?
তোমার কথা উদ্ভিদ হয়, গাঢ়তর ছায়া ফেলে :
উদ্ভিদের শিকড় গভীরে, উদ্ভিদের গভীরে শিকড়;
হৃদয়ের ভিতরে হৃদয়
তুমি জলের দাগে চিত্রিত নও :
তোমার কথা উদ্ভিদ, তুমি উদ্ভিদের শরীর

দেবাশীষ সান্যাল

ইঙ্গিত

বলাকা হয়ে আকাশকে বলেছি—সুন্দর
বৃষ্টি হয়ে মেঘকে আমি বলেছি—শাশ্বত,
প্রজাপতি হয়ে ফুলকে বলেছি—ভালবাসি,
নাপাম হয়ে ধনীকে গর্জেছি—বিপ্লব।

মদনমোহন বিশ্বাস

চূর্ণ পদাবলী

১ বলেছিলে তবু কিছু বাকি আছে
এখনও সময় আবর্তিত নয়
এখনও ইন্দ্রিয়গুলি অনর্গল নয়
নাকি অপেক্ষায়
বোধির সীমানা স্পর্শ করা যায়!

২ আমার নির্জনতা ভেঙে
মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসে
পুনরায় দৃশ্যাবলী
উচ্চারণগুলি
অতলান্ত নির্জন সমুদ্রে।
৩ প্রতিটি ঢেউ নূতন
প্রতিটি ঢেউ পলাতক
তুমি এক মধুর অতৃপ্তি
৪ তুমি এলে না
বৃষ্টির অপর রেখার ওপারে
রয়ে গেলে
এপার থেকে আমি
ছায়ার শূন্যতা
ভরাট করে চলি।

স্বস্তি চট্টোপাধ্যায়

বুকের মধ্যে

বুকের মধ্যে ব-দ্বীপ ভাঙা জোয়ার ছলছল
কে এসে হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করে তুই স্বস্তিকে চিনিস্?
না কি সেই চোখজলা পুতুলটা, বুড়োবট সাক্ষী আছে; মৃদু হাসি
ও উন্মাদ হয়ে গেছে।
আমি উজ্জ্বল রোদের মধ্যে সাদাদাড়ি বুড়োকে নামাজ পড়তে দেখেছি
আমি গড়ের মাঠে বিকেলে বিমর্ষ সন্ত্রান্ত কোচোয়ানকে চিনতে পারি
আমি উদভ্রান্ত বালককে ভীষণ ভাবে চমকাতে দেখেছি
এবং শত শত শুকনো পাকা পাতাকে ঝড়ের পাখি মনে করে
বৃক্ষের পুরোনো বেদনায় নীল হয়ে গেছি।
কি অক্লেশে সমুদ্রকে অবাধ কল্পনা করি
বকুল আমার বকুল, তুমি শুকনো হয়ে গেলে
সেই বুড়ি এসে জিজ্ঞেস করে, তুমি স্বস্তিকে চিনেছ কি বাছা?
বুকের মধ্যে ঝড়ের পাখী ঝটপট করে ওঠে, নিশুতি রাতে রাস্তায়
মাতাল পায়ের ছাপ ক্রমশঃ হারিয়ে যায়, ক্রমশঃ হারিয়ে যায়।

তুষার বন্দোপাধ্যায়

নির্জনতায়

নির্জনতায় আত্মনিবেদন—
বুকের মধ্যে শব্দ গুরুভার
পাহাড়তলী ছেড়ে এসো বন
সমর্পণের দৃশ্য চারিধার।

সহজাত পীড়ায় জ্বলে মুখ
চন্দ্রাহত হরিণ লতার ছলে
শিউরে ওঠে ভীরু তোমার বুক
ভাগ্য ফোটায় উভয় করতলে।

নির্জনতায় ভালোবাসার সুখ॥

শ্যামল রায়

স্বপ্ন ছাখার বাতাস

এমন ক'রে কে বাজালো করতালি:
জানলা খুলে বাইরে আমি চমকে দেখি
কেও কোথা নেই রাস্তা খালি,
রাস্তাখানা ঘুমিয়ে আছে স্তব্ধ একি!
স্তব্ধ দুপুর রাস্তাখানা ঘুমিয়ে আছে
আমার ঘুমে স্বপ্ন ছাখার বাতাস আসে,
ঘুমিয়ে দেখি কে যেন হায় এমন কাছে
বাতাসে কার গায়ের চেনা গন্ধ ভাসে?
গন্ধমাতাল ভর দুপুরে দাঁড়িয়ে একা,
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন ছাখার স্বপ্ন দেখি
হঠাৎ পথে চলতে তাকে যায় না ছাখা—
কেমন ক'রে বোঝাই দেবু দুঃখ সেকি।
স্বপ্ন এবং দুঃখ ঘুমের সঙ্গদানে
ধার করা পান গানের সুরে মেজাজ আনে॥

অর্পিতা রুদ্র

আকাশ হল ভালবাসা

আরও কাছাকাছি এস, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে, শব্দহীন কথা বল
বল অব্যক্ত ভাষায় স্বপ্নমাখা মনের নীড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে। অতল সমুদ্র
স্তব্ধ কোন মায়ায়, কোন বেদনায় নীলাভ তার চেতনা,
প্রেমই দিয়েছে বুঝি অমৃতের পাত্র ভরে অপ্রাপ্তির রুদ্ধ যন্ত্রণা!
আরও কাছাকাছি এস, দু চোখের অসীম সীমানায়, অদৃশ্য অশ্রুত
কণা দিয়ে উর্বরা কর উষর অন্তর, অসংখ্য প্রাণের অংকুর জাগিয়ে।
তোমার বিদেহী সত্তায় তারার স্মৃতি
লক্ষ লক্ষ জন্মের ফোটা ফুলের রেণু নৈবেদ্য সাজিয়েছে আজ—
মেখেছে প্রীতির চন্দন, ভালবাসার পূর্ণিমা তিথিতে বাজে অশান্ত বেণু।
আরও কাছাকাছি এস, পরম শূন্যতার আত্মায় থাকো শাশ্বত হয়ে
বিশ্বের প্রতিটি অনুতে মিশিয়ে নিও আমার শৃঙ্খলিত আত্মাকেও।

অভ্র ঘোষ

পাতাবাহার অন্য খেলা

খুঁজব বলেই বেরিয়েছিলাম অনেক দূরে—
বৃষ্টি ভেজা বাউল শরীর
খোঁপা বাঁধার মন্ত্র জানি,
আবছা ছায়া ঘরের ভিতর
'শকুন্তলা শকুন্তলা' আঁচল টানি
এই খেলা নয় সামনে দাঁড়াও
পাতাবাহার অন্য খেলা
সংসারে যে অসুস্থতার বৃত্তমালা,
এই হাতে তুই মালা গাঁথিস কোন্ সাহসে
তোর দুঃখে এমন মূর্খ কাঁদবে নারে

খুঁজব বলেই বেরিয়েছিলাম অনেক দূরে
দুঃখ-শোকের বোধ যে তবু ফিরল নারে।

সুশান্ত বন্দোপাধ্যায়

চিড়িয়াখানা

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ
এ'গুলো হ'ল জানোয়ার যারা খুব
সামান্য পুঁজিতে বেঁচে আছে : এ'গুলো হ'ল
বাচ্চা শুয়োর, যাদের পিতা ও পিতামহ
শহরে বাস করে সম্পূর্ণ শাহরিক—

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ—
শোনা যাচ্ছে
তৃণভোজী এইসব গণ্ডারের দল
জলহস্তীর সঙ্গে মিশে একেবারে
গোল্লায় গেছে—কারণ সেদিনও নাকি
বাঘের খাঁচায় এরা মরা গরুর হাড়
চুরি করতে গিয়েছিল—
সত্যিই খুব দুঃখের কথা—
কারণ শুধু মানুষই নয়—এ'সব জন্তুরা
যারা ছিল ব্যাকরণে নির্ভুল সত্য—তারা
আজ প্রোটীনের খোঁজে বুদ্ধিজীবি প্রায়
এবং শোনা যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই এরা
নতুন শহরের খোঁজে চাঁদের পাহাড়ে পাড়ি দেবে—
ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়—চলুন
আমরা ওদিকে পাখীর খাঁচার দিকে চলি।

অসিত ঘোষ

স্বপ্নের নারীর প্রতি

শুনতে পাচ্ছো? নূপুরের রিনিঠিনি ধ্বনির মতো নির্ঝরিণীর কলকল চাঞ্চল্যের মতো অবিরাম শব্দ ওঠে। অথচ কোন প্রস্রবণ নেই, কোন আবশ্যিক

পাহাড়ী উচ্চতা, অথবা নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত প্রবল প্লাবনে ভাসে না হৃদয়।
শুনতে পাচ্ছো ? অবিরাম কিসের ধ্বনি সকল সময় মুখরিত বুকের ভেতর
দেওয়ালে আছড়ে পড়ে পাহাড়তলীতে প্রতিধ্বনির মতো চারিদিকে
ভালোবাসা, ভালোবাসা—শুনতে পাচ্ছো ? কোন প্রস্রবণ নেই, জল, মাটি,
পাহাড়ী উচ্চতা অথবা ভূগর্ভের প্রবল চাপে বালুকণা মিশ্রিত স্রোত নেই—
শব্দ ওঠে! রিনিঠিনি নূপুরের ধ্বনির মতো নির্ঝরিণীর কলকল চাপল্যের মতো
অবিরাম শব্দ ওঠে। শুনতে পাচ্ছো ? বাঁদিকে কান পেতে রাখো সচেতন
সজাগ থাকো, শুনতে পাবে—বুকের ভেতর, দেওয়ালে দেওয়ালে আছড়ে পড়ে
পাহাড়তলীতে প্রতিধ্বনির মতো চারিদিকে ভালোবাসা, ভালোবাসা—

দ্রোণাচার্য্য ঘোষ

করতলে করতল

করতলে করতল শূন্য ছিঁড়ে অবশেষে নিজের ভিতর
একলা গোপন ক্ষতে অন্তপ্রায় বয়সের লোভ,
করতলে করতল ম্যাজিকের মতো শূন্যে—শূন্য শূন্য—তারো শূন্য
নিজেদের ক্ষোভ—
অন্ধকার দ্রুতলয়ে ড্রাম পিটে বলে দেবে দেহের খবর।
অন্ধের চোখের নিচে মাঝে মাঝে চুরি যাওয়া হাড়-রক্ত থেকে
বিজন পথের জ্যোৎস্না, অথবা অসীম সন্ধ্যা, অথবা সে রোজ পাওয়া
কর্মখালি বিজ্ঞাপন, অথবা—ইত্যাদি……
কাতরতা ছিটকে ওঠে, সুদূর দেশের ধান শিষ্ ছিঁড়ে তুলে এনে
পুনরায় সেই দেশে রেখে
করতালিহীন শব্দে অসহায় নির্জনতা ভিক্ষা করে মূঢ় প্রতিবাদী ;
জীবিকার ভয়াবহ জ্বালা আছে সারা দেহে, ক্রোধের উত্তাপ নেই
রুটি আর লাথি দুই-ই সমান নির্মম পেট পিঠে—
বিবেক ছোকরার গায়ে তাপ্পি মেরে তাপ্পি মেরে রিফু থেকে রিফু আরো
করে করে মুখোসেই
ঢেকেছে নিজের মুখ, ঢেকেছে নিজের মাথা, পরিশ্রমহীন গল্পে
বড়ো মজা ক্ষয়রোগ নেই কোনো গিঁটে।
তবু আছে চতুর্দিকে সাদাহাত বিশগুণ খ্যাতির আমেজে,
অন্ধকার পাদদেশে কররেখা পেতে দিয়ে উপুড় শরীর—
আর কোনো কথা নেই, আর কোনো ইচ্ছা নেই, চেতনার গভীরের
থেকেও গভীর
শুধু এক নিশ্চেতনা। শত ড্রাম পিটে তাতে নিজের গভীর জন্ম
ওঠে না সে বেজে!

অভিজিৎ সরকারের তিনটি স্বগতোক্তি

আর তো কিছুই পারা গেল না এইবারে

আর তো কিছুই রইল না
কিছুই পারা গেল না এইবারে
শুধু,
আমার দৃষ্টির আরামটুকু রেখে যাচ্ছি
প্রতিপালনের জন্য তোমার কাছে
পারো তো মানুষ কোরো !

দেবার ইচ্ছে ছিল যেমন সংসারে সবাই চায়
চৌখুপী ঘরের বাহারে জীবনের নায্য পরমায়ু
সন্ধ্যায় একশ ওয়াট তীব্র জ্যোৎস্নায়
দু-কাঁটা উল্টো আর এক কাঁটা সোজার
ঠাসাঠাসি ঘর

কিছুই হল না, বেড়ালের চাতুরিতে
সারা ঘরে পশমের জট ছেয়ে গেল
আমার সবুজ বাতি কারা যেন ছল করে
ভেঙে দিল
এদিকে বুকের ঘরে এফ কাঁটা উল্টো আর
এক কাঁটা সোজার পশম বেড়ে যাচ্ছে
কিন্তু কিছুই দেওয়া যাচ্ছে না—
দেওয়াও যাবে না এইবারে
ভীষণ কষ্ট হবে যখন ছাউনিতে ঢেকে যাবে ছাদ
অথচ কিছুই পারা যাবে না ; পারা গেল না
কেবল দৃষ্টির আরামটুকু রইল আমার
প্রতিপালনের জন্য তোমার কাছে
পারো তো মানুষ কোরো !!

প্রচলিত মুখগুলি

তোমাদের প্রচলিত মুখগুলি ভুলতে বসেছি
কপট দরজা খুলে সন্ন্যাসিনী আলোয় বধির
দিন চলে যায় প্রথাশূন্য, ঘরময় জাফরানী ছবি ;
পরন্তু গৃহস্থ হাওয়ায় ধুয়ো তোলে সম্ভাব্য চুড়ির।
প্রচলিত বিশ্বাসও খসে গেছে, যেমন আঙুল থেকে
প্রতিজ্ঞার আংটি গেছে হঠাৎ হারিয়ে ; —শুধু পদাবলী গান
বুকে পুষছি, অথচ অবাক, প্রচলিত মুখগুলি ভুলে যাচ্ছি
গৃহস্থ হাওয়ায় চুড়ির শব্দ সারা দিন স্পন্দমান।
ইচ্ছে হয়, নতুন সোহাগ কিনি এ মাসেই—এ ঘোর শ্রাবণে
ঘর থেকে মুছে নেবে বর্তমান দিনগুলি জাফরানী আঁচল—
দিনান্তের গোধূলিতে, প্রচলিত মুখগুলি ভুলে গেলে,
মনে পড়বে কদাচিৎ তোমাদের বিশেষ আদল !

অন্তিম আলাপ

নিঃশব্দে নীল ভেঙে গেছে
সর্বাঙ্গে ধূসর যন্ত্রণা ; কদাচিৎ
রক্তাভা লেগেছে মণ্ডলে……
মোহান্ত, সময় হয়েছে কি ?
দিনান্তের ডাক আজও এলোনা
যথাযথ—এ বছরে ডাকঘরে
কারচুপি জমেছে অঢেল !

মোহান্ত, মাঠে এসো, সন্ধ্যায় লেগেছে
সন্দেহ—নিঃস্তব্ধ বকুলতলা কার
দুঃখ আঁচলে ঢাকছে ?
মোহান্ত ; ঘর ছাড়ব ? —ডাক আর
এই বনভূমে
আসবে না মোহান্ত...মোহ—ন...ম——ন !!

শংকর বসুর আলোকসন্ধানী কবিতাগুচ্ছ

১.

যেদিন তোমায় প্রথম দেখি সেদিন থেকে ভালোবেসেছি আমি
যেদিন তোমায় প্রথম দেখি সেদিন থেকে ভালোবেসেছি আমি,
পথের পাশে দাঁড়িয়ে তুমি কিনছিলে হে শিউলিফুলের মালা
পথের পাশে দাঁড়িয়ে তুমি কিনছিলে হে শিউলিফুলের মালা
সেদিন থেকে স্বপ্নে আমার, তোমার ছবি অন্তরেতে আঁকা
অন্ধ রাতে বদ্ধ ঘরে স্বপ্নে আমার, তোমায় খুঁজে দেখা
সেদিন থেকে স্বপ্নে আমার, তোমার ছবি অন্তরেতে আঁকা
অন্ধ রাতে বদ্ধ ঘরে স্বপ্নে আমার, তোমায় খুঁজে দেখা
কিন্তু তোমার মন মেলে না, মন কি তবে অন্য পথের পান্থ
সারাক্ষণই খুঁজছি তোমায় মিলছে না তো তবু তোমার সাড়াও
একটুখানি দাঁড়াও কাছে, একটু কাছে সামান্যক্ষণ দাঁড়াও
মন না পেলেও সারা জীবন সুদূর থেকে দেখবো তোমায় দেখবো অনন্ত।

২.

জুলাইয়ের শেষ রজনী, রজনীগন্ধার মালা দিয়ে তোমায়
বিদায় বাণী শোনানো হ'ল না ; অথবা,
তোমার সিক্ত করতলে রাখা গেল না
সূর্যের উত্তপ্ত আশ্বাস।
অথচ তুমি আমায় হৃদয় খুলে পাপড়ি দিয়েছ
দিয়েছ লিপিকাকে আমার ক্লান্ত ঘরে।
বুক চিরে বৃষ্টি দিয়ে বলেছ,
"লিপিকা তোমার সঙ্গী হবে।"
আজ রাতের ইজেল থেকে ; তোমায় কিনে নেবে
আগন্তুকের মহাজন। চড়া মুনাফার লোভে
একবছর, ঠিক এক বছর তুমি থাকবে
অন্ধকার ঘরে……

যেখানে প্রবেশের পথ নেই জানা আমার
অথবা, লিপিকা-র।

৩.

জুলায়ের রাত চলে গেল অবশেষে
আমি বসে আছি একা এ শুব্ধরাতে
বিজন ঘরে স্মৃতি শুধু পান ক'রে
রাত বেড়ে চলে শূন্যের হাত ধরে
জুলায়ের রাত চলে যায় নিঃশেষে।

আকাশ ঘিরেছে কালো আর লাল মেঘে।
ঝাউয়ের ঘরেতে বাতাস নেমেছে বেগে,
পাইনের বন কেঁদে হ'ল সারা,
লিপিকা তোমার মেলে না ত সাড়া
আগষ্ট মাসের রাত্রি ভরে আমি একা শুধু জেগে।
বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে ঝরণা ধারার বেগে।

লিপিকা তোমার সাড়া মেলে নাত
যত সুরে আমি ডাকি
এত আহ্বানে দিল না তো ধরা
তোমার হৃদয়পাখী।

ভুলে যাই শুধু, তুমি যে নির্বাসিতা।
জুলায়ের রাত বিদায় বেলায়,
তোমায় নিভৃতে ডাক দিয়ে যায়।
চলে যাও তুমি ধীর দুটি পায়,
রেখে শুধু স্মৃতিরেখা।

৪.

আঁধার ঘরে রাত্রি নামে বুকের মাঝে রাত্রি নামে
নিকষ কালো রাতের ছায়া দেয়াল জুড়ে, বুকের গোপন
অন্তঃপুরে ঘুরে বেড়ায়। বুকের নীচে মনের কোণে
আশা জাগে। আশা দোলে অন্তঃপুরে দেখি স্বপন
মৃত্যু পথের। নীলে ঘেরা মৃত্যু দ্বীপে আলো জ্বলে
সমস্ত রাত সমস্ত রাত আলো জ্বলে, নীলের বাতি।
সমস্ত রাত বাতিঘরে
রাতের ঘরে তারার মিছিল শব্দ করে……

৫.

ঘুম ভাঙতেই নিটোল সোনালী রোদ জানলা গলে এল ঘরে। সারারাত যে গোলাপ গাছটা ছিল মেঘের আলোয়ান মুড়ি দিয়ে সে এখন হাসছে। সূর্যের ঘনিষ্ঠ উত্তাপ আমায় সমবেদনা জানাচ্ছে, কারণ রাতের আকাশে ক্লান্ত মেঘ দেখে আমার মন বিষণ্ণ হয়েছিল।

ভেজা শিউলির সৌরভ গায়ে মেখে শরতের সবাইকে দিচ্ছে তাগাদা। পরিচ্ছন্ন পথে চলার জন্য কোন সঙ্গী লাগে না। এই সময় যে পথে নামে, পথই তাকে সঙ্গ দেয়।

সমস্ত সকাল জুড়ে হিমেল হাওয়া বইছে, যদিও হাওয়ায় হিমের আঁচ খুব কম। ঘাসের বুকে শিউলির মিছিল থেকে ছিটকে আসা ঘাসফুল আগমনীর স্তোত্র উচ্চারণ করছে। এখন পলাশপুরে সকাল। তার মেঠো পথে চলেছে গোরুরগাড়ীর সারি। সারি চলেছে আমার ঘরের সামনে দিয়ে।

সবাই বাজারে যাবে। বাজারে যাওয়া অনিবার্য যেন। তেল নুন লকড়ির চিন্তায় বাজার দর ওঠানামা করবে। মানুষের সওদা নিয়ে সওদাগর ঘরে ফিরে যাবে। পলাশপুরের বাজারে রোদের গাঢ় দাক্ষিণ্য ঝরবে।

পলাশপুরের সকাল ক্রমশঃ বিষণ্ণ হবে। যেন বিষণ্ণ হওয়া অনিবার্য তার। অথচ জানি বিষণ্ণতাই তার এখানে আসার ঘোষণা। রোদের আঁচে স্নান করে সূর্যমুখী শুধু সুখী হবে। পলাশপুরের বাগানের সূর্যমুখী। রোদের দিকে পিছন করে পথ হাঁটবে মানুষগুলো। সূর্যকে ভয় করবে।
তবু পলাশপুরের আশ্চর্য সকাল রোজ আসবে……

শিবাণী সরকার

পথ হারাই

বৃষ্টি-ধোওয়া গাছের মতো তোমার চোখের দিকে
চাইলেই আমি তোমায় দেখতে ভুলে যাই, শুধু
চোখ দুটো দেখি ; গোধূলির রঙমাখা, নীড়ে-ফেরা
পাখীগুলোর মতো তোমার চাহনিটা সরে যায়। আমি
চোখ নামিয়েই ভাবি, যাঃ, ভুল হয়ে গেল, দেখা
হ'ল নাতো, কি রঙের শার্ট পরেছ, ট্রাউজারটাই বা
কি রঙের ছিল। তখন নিরুপায় মন তুলিটাকে তুলে নেয়।
ভেবে রাখি, নিশ্চয়ই দেখে নেব কাল, কি রঙের শার্টটা, সবুজ, নীল না লাল
আবার দেখা হয় তোমার সঙ্গে, তুমি ভাব নিশ্চয়ই,
অচেনা মেয়েটা তাকায় কেন অমন করে, বুঝি বা বিরক্তও হও,
আত্মপ্রসাদ লাভ করো না কখনও ?···আমি তাকাই
তোমার শরীরের দিকে, বুক খোলা টি-শার্টের মাঝে দেখি
গহন অরণ্যের হাতছানি, মুহূর্তেই পথ হারাই, সব ভুলে
তাকাই চোখের দিকে, বিস্ফারিত চোখে এক অদ্ভুত
আলোর নিশানা দেখি অন্য কারও প্রতি।·····
আমার অস্তিত্ব তীরবিদ্ধ হয়। আমার ঘরের দেওয়াল ফেটে চৌচির
সোফাসেটে সাজানো দালান ধ্বসে পড়ে সমাধিস্থ হৃদয়ের ঐশ্বর্য।

দীপক সান্যাল

যখন বৃষ্টি পড়বে

একদিন পৃথিবীর সবকিছু ভেঙে দেব মাটি সমান। বড় বড় স্কাই-স্ক্রেপারগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো, বাতাস বাধা পাবে না। বাতাস, শুধু বাতাস, চারিদিক থেকে বাতাস আমাকে জড়িয়ে ধরবে।
আমি পালাব না, প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেব। গ্রীষ্মের উত্তাপে 'আজ ভীষণ গরম' কেউ বলবে না, আমি সব উত্তাপ বুকে টেনে নেব, রেখে দেব, কোন গোপন সঞ্চিত ধন হিসাবে, কেউ জানবে না। যখন বৃষ্টি পড়বে সব উত্তাপ বুক থেকে টেনে বার করে বৃষ্টির সাথে মিশিয়ে দেব।

কবিতা নিয়ে কবির অভিমান সদাসর্বদা।
তার গদ্যভাষ্য না দিয়ে কবি অপারগ।

শুভঙ্কর ঘোষ

মনে এলো

কবিতাবিষয়ে ব্যক্তিগত চিন্তাচরিত্র পরিতাপহীন শূন্যতার দোসর হবেই এমনতর আপ্তবাক্য ঘোষণা নিরাপদ নয়, কেন না নির্ভুল নয়। তথাপি কবিতা রামধনুকে দারুণ সামীপ্যে টানে। যেহেতু রঙের যৌবন এক গঠন-মূলক সন্ধিক্ষণের ঔরসে জন্মায়। এবং এ উপলব্ধি খুবই তাৎপর্যচিহ্নিত যে কবিতা নিছক কথার ছবি নয়। নয় দ্রুত উন্মোচন ; তার চলাচল পাণ্ডুলী-উন্মিলনের মতন ধারাবাহিক ; অর্থাৎ প্রস্তূয়মান ভূমিকার অনুগামী। কবিতা এমন একটি পরম শব্দমন্ত্র—লোকায়ত নির্জনতা—সৌম্য কলতান—দীঘল ধ্বনি উচ্চারণ ; সর্বোপরি এমন একটি জীবনসর্বস্ব সংগ্রাম—যার রূপরসবর্ণ-গন্ধ স্পৃশ্য নয়,—না, স্পৃশ্য ঠিকই—কিন্তু তা অনুভূতির আশ্লেষে, বিস্তর তাৎপর্যে।
কবিতার গোড়ার কথা শুধোলে সবিনয় নিবেদন জীবন যৌবনের সর্বাপেক্ষা দীপ্ত ও অস্থির অভিমানের অন্য নাম কবিতা। যদিচ, আপাত প্রেক্ষণে কখনো সে শান্ত বৃক্ষ ; কখনো বা দুরন্ত অববাহিকা। বস্তুত, অভিমানের প্রতিশব্দ সৃষ্টির যন্ত্রণা। অর্থাৎ, প্রোথিত ও ব্যাপক অর্থেই অভিমান সৃষ্টির যন্ত্রণায় মনোনীত। ক্রমশ'র ঐশ্বর্যে ভাবগত আন্দোলন উচ্ছ্বসিত হ'লো কবিহৃদয় টের পায় না বস্তুগত প্রতিবিম্বে জৈব নির্দেশনামা। সে ছটফট করতে থাকে অ-দৃশ্যের জাদুকৃত্যে, মোহন ইঙ্গিতে। রচনা প্রণালীর এই চলচ্চিত্র হয়ত বা প্রেরণার গোপন অভিসার, বা মানসিক তাগিদ। প্রাণকাড়ানি যন্ত্রণার বেগ ও আবেগের জোড়কলমে, অনেক সংস্কার ও মার্জনার অবকাশে—অবশেষে গড়ে ওঠে কবিতা, মানব মনের দ্বিতীয় ভুবন।
কবির কাছে কবিতা হৃদপিণ্ডের স্পন্দনের মতন সত্যতম। কবিতা কাকে বলে এ প্রশ্নে শান না দিয়েও বিনীত স্পর্ধায় বলা চলে, কবিতার কোনো ব্যাকরণ নেই। যা আছে তা শুধুই হৃদয় মোচড়ানো ব্যাথা, অতৃপ্তির বেদনা,

ক্ষতচিহ্নের অস্থিরতা—ঠিক রমনীর প্রসবব্যথার কাছাকাছি, হয়ত বা আরো কাছে, আরো কিছু ঘন আচরণ, তারো বেশী আরো কিছু আলো উৎপাদক সূক্ষ্ম অন্ধকার; এবং ঝংকার-সম্পন্ন সংরাগ।

কবিতা ভেবে লেখা ভালো অথবা লিখতে লিখতে চিন্তা করা ভালো, এ নিয়ে তর্ক করা নিছক অবান্তর। তথাপি, এটুকু জানালে অন্যায় হবে না যে কবির ভাবগত আকাশ কখন কী রূপ নেবে, তা বলা কঠিন। সেহেতু অতৃপ্তি-জনিত অস্থিরতা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ শিল্পইতিহাসে স্রষ্টার জীবন এর অন্যথা হ'লে বা সান্ত্বনাব্যাপারে প্রকাশব্যাপারে তৃপ্তি দেখা দিলে শিল্পীর অপমৃত্যু ত্বরান্বিত হয়ে আসে। ভুল বুঝলে চলবে না এই ভেবে যে এ-জাতীয় অস্থিরতা, আত্মপ্রত্যয়ের কলহনিপুণা ননদিনী নয়; অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতার স্মারক নয়; পরন্তু, আত্মপ্রত্যয়ের গোপন সাধনায় পরম হিতৈষী।

এই মাত্র বলেছি, কবিতার কোনো ব্যাকরণ নেই। প্রকৃতপক্ষে, কবিতা ব্যাকরণের গন্ধ-সত্ত্ব বিধান কেন, সে কোনো ব্যাকরণই মানে না। তার মানে এই নয় যে ভুল বানানে ভরা কবিতা খুব সুখপাঠ্য। আমি বোঝাতে চাইছি, প্রয়োগবিধির স্বাধীনতা সম্পর্কে; শিল্পে নির্দিষ্ট কোনো লাইসেন্স নিয়ে কাজ করা চলে না। ফলে কবিতার বিস্তার সীমান্ত পেরিয়ে অজ্ঞেয় ঐশ্বর্যে কৌলন্ত পেতে চায়। কবিতার পথ অনন্ত অসীম। তাহ'লে দেখুন, যে-পথের সীমা নেই, অন্ত নেই, সেই পথের আবার সীমান্ত কি? অর্থাৎ কবিতাও ক্লান্তিহীন। তবে কবিতার ক্লান্তিবিষয়ক বক্তব্য যে রাখা যাবে না, তাও নয়। অর্থাৎ জীবন যেমন চতুর্দিকপ্রসারিত কবিতাও তদ্রূপ। আর একথাতো শুরুতেই বলেছি. কবিতার অন্য নাম জীবনসর্বস্ব সংগ্রাম। খুঁটিনাটি যা কিছু দৃশ্য, আত্মার নিকটবর্তী, সময়নিরপেক্ষ ও অনুভবের দ্যোতক—তাই-ই সম্ভাব্য কবিতা। সমগ্রত, কবিতার অস্তিত্ব আদিগন্ত ও আদ্যন্ত। সমস্ত কিছুর মধ্যেই ছন্দ আছে, ছন্দ শোনার মতন কান ও প্রাণশক্তি থাকলে নিশ্চিতই বলব ছন্দ আক্রান্তহীন না হলেও উপলব্ধি তাকে টেনে তুলবে কবিতার অবয়বে। সমস্ত কিছুর মধ্যেই যেমন ছন্দ, তেমনি কবিতার সম্ভাবনাও ভ্রূণ। কবির তপস্যা সেই সম্ভাবনাকে তাপ দেওয়া, লালিত করা, আলোকিত করা; বোধের ঔরসে সুষ্ঠু রূপ দেওয়া, 'কবিতা' এই বিশেষ ও মধুর সম্মানযোগ্য সুরেলা শব্দরসকে সম্ভাবনার অস্থিতে মাথিয়ে স্বাস্থ্যদান করা; বড়োকথা প্রাণদ উত্তাপ দেওয়া আর ধ্বনিলাবণ্যের সহযোগিতায় পৌঁছে দেওয়া; কখনো তা আপন স্বভাবের স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল হয়. কখনো তাকে শীলিত বুদ্ধির গাঢ়তায় ডুবিয়ে নিতে হয়। তাই কবিতা বলতে ইনটলেক্ট বা ইনট্যুইশনের মিশ্রণ নয়, মিলন—সম্যক মিলন। মেধাচর্চিত ও হৃদয়তাপিত প্রকাশ একত্রে পেলে কবিতায় দোঁ-আঁশলা অস্থিরতা বা দোলাচলতা প্রকট হতে পারে, এমন সন্দেহে আমি নিরুচ্চার নই। কিন্তু অনাস্থাপ্রস্তাবকও নই। কবির নিজস্ব ক্ষমতার আপেক্ষিকতার ওপর ওই ডুয়েট-পদ্ধতির সাফল্য বা নিষ্ফলতার প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে থাকে। আমি মানি, কবিতায় সুঠাম ভঙ্গি দরকার। তাই ব'লে, কবি যেন ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাবার চেষ্টা না করেন। কবিতায় বজ্র আঁটুনি থাকবে ঠিকই। থাকাও ভালো। কিন্তু বিপরীত জ্ঞান—ফস্কা গেরো?? তাকে কি পুরোপুরি খারিজ করা উচিত বা সম্ভব? কবিতায় বাঁধুনি থাকবে বা থাকা উচিত। অন্তত যতটা সম্ভব। তবে ভুললে চলবে না, শিল্পগত গৃহিনীপনায় কৃতিত্ব অর্জন করা অনেকখানি অভ্যাস ধ্যান ও মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। সবচেয়ে বড়ো কথা, স্বভাবের সূত্রপাতে প্রকরণ যতটা পিনদ্ধ হ'লো, তার সঙ্গে কবিভাষা ও বাসনালোকের সুষমা ও সামীপ্যে, দীপ্র-ধূসর চর্চা, আলোছায়ার কৌতুক, মেঘরৌদ্রের দিনলিপি, আষাঢ়ে আকাশের খেয়ালিপনা ও আমেজ মিলিয়ে নিলে মনে হয় না হিসাবে গরমিল হবে। কারুকার্যের বিজ্ঞাপনই কি কবির অভিজ্ঞান মন্ত্র? কদাপি নয়। যা সত্য, তাকে ঘিরে মনের গোপন আবর্তন ও উদাত্ত প্রকাশই কবির ঈপ্সিত সত্য। কেন্দ্রগত জীবন সত্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে পারিপার্শ্বিকতাকে যদি আঘাত করতে হয়, প্রচলিত চিন্তাকে যদি যাচিয়ে নেবার চেষ্টা করা যায়—তা হ'লে কবিতার রাজ্য থেকে কবিকে যোগাযোগ-হীন নির্বাসন মেনে নিতে হবে এমন বিধান কেউ বেঁধে দিতে পারেন না। কবি তখন ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন; এরকম ঘোষণা ক'রে গণভোট অর্জনের চেষ্টা করলে কবির বিন্দুমাত্র বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই। আর যাইহোক, তিনি বিষণ্ণ হবেন না। কেন না, তিনি জানেন কবিতা নিজস্ব মর্মে অবিমিশ্র স্বপ্নশিল্প নয়। ভাষা কিম্বা ভাব অত্যধিক সূক্ষ্ম মসৃণ বা পেশল হলে কবিতার জাত যাবে কিম্বা তার চরিত্র নষ্ট হবে এ তত্ত্বজ্ঞানে কবি নিদারুণ উদাসীন বা পরিপন্থী কিম্বা সতর্ক। কবি যা লিখবেন তা মর্মগোচর ভাবের

অনুষঙ্গ দান করবে। অবশ্যই নরম গাম্ভীর্যে নয়, তথাকথিত লিরিক্যাল কম্পনে নয়। কবির বিকাশ ব্যথাদীপ্ত কবিতায়, দহনতৃপ্ত শৌর্যে।

চৈতন্যের এক অব্যক্ত যে আন্দোলন, তাকে প্রকাশ্যে ফুটিয়ে তোলার সাধনাতেই কবির সিদ্ধি। অস্কার ওয়াইল্ডের সেই পাখিটার কথা ভাবুন, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় তার ধ্যানের ঐশ্বর্যে। গোলাপ কাঁটায় বুক বিঁধিয়ে সে রক্ত দিয়ে রক্তগোলাপ ফোটাতে চাইছে। সে যে যন্ত্রণায় আনন্দকামী, তার গভীরে রয়েছে সৃষ্টির আনন্দ। এই আনন্দ-সুন্দর যন্ত্রণা সইতে পারলে, এই উদ্দীপ্ত যন্ত্রণার তাৎপর্য বুঝতে পারলে কবিতারচনা সম্ভব। তখন, কবিতায় নক্ষত্রের মালা বোনা যায়, উল্কাপাতে কবিতার রস পাওয়া যায়। তীব্র শোকে উপশমের স্থৈর্য মেলে। সমস্ত হৃদয় জুড়ে উদাসীনতার মহিমায় সত্যকে গাঢ় করা যায়। ব্যক্তিগত আমার বিশ্বাস, একালের কবি কেন সর্বকালের কবি একটা-না-একটা প্রত্যাঘাতে, যন্ত্রণার চাবুকে প্রাণিত ও কর্মিষ্ঠ। কর্মিষ্ঠ এই অর্থে যন্ত্রণার কাঁটা বুকে নিয়ে নিবেদিত রক্তে করবী ফুটোনোর উন্মাদনায় প্রতিটি কবিই গৃহস্থ বাউল। আর নবজাতক প্রতিটি কবিতার নাম রক্তকরবী। সমাজের পটে, কবিতা বিশেষত সাম্প্রতিক কবিতা যেন সন্দিগ্ধ সময়ের রক্তাক্ষয়ী সংগ্রাম। বিস্মিত উক্তি মনে হলেও উপলব্ধি দিয়ে যাচিয়ে নিলে বোঝা যাবে, পৃথিবীর দারুণ দুঃখের দিনে, শেষ সান্ত্বনা কবিতা। জীবনের জন্য যৌবনের অভিজ্ঞান যে কবিতা, তার প্রতি কবিচিত্তের প্রেম নিরন্তর নিবিষ্ট। গত দশকের কোনো কোনো কবি এই ধারণা ও বোধ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন—'শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম / শুধু কবিতার জন্য কিছু খেলা…/ শুধু কবিতার জন্য এত রক্তপাত / …শুধু কবিতার জন্য আরো দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে লোভ হয়।' তাই বলি, বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে একালের কবি, কবিতার স্বার্থে নিজের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। কবিতা ও জীবন তার কাছে সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর পার্থক্য নিয়ে উপস্থিত হয় না।

কবি কি স্বয়ংশাসনে পূর্ণদীপ্ত? এ প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন। বলা ভালো, কবি স্বয়ংশাসন দীপ্ত হোন বা না হোন তিনি যে পূর্ণদীপ্তি লাভের সাধনায় আত্মমগ্ন—এ সত্য কে অস্বীকার করবে? কবি ভূমিও মানেন। ভূমাও মানেন। তিনি সত্যের মূল্যে ক্ষমাপ্রার্থী। সত্যের সাহসে ক্ষমাসুন্দর। তাঁর কাছে মাঠ সত্য, মাটি সত্য। আকাশও সত্য। তাঁর মন সর্বত্রচারী। মেরুঅঞ্চল থেকে মরুঅঞ্চল পর্যন্ত। তাঁর মনে ভূস্বর্গ কৌতূহল জাগায়। আবার ফুলের পৃথিবীও কোলাহল জোগায় মনে মনে।

আসল কথা, কবির হৃদয়জারিত মূল্যবোধে কোনো গজফিতে মাপা ডাইমেন্‌সন নেই। তাহ'লে তর্ক উঠবে কবি কোন অধিগত বিদ্যার জোরে সাধারণের ওপরে টেক্কা মেরে বেরিয়ে যেতে জানেন? তিনি কি কোনো অমৃতময় শক্তি সংগ্রহ করেছেন? তিনি কি বিধাতার ব্যক্তিগত সচিব অথবা তাঁর নোট-অনুলিখনে স্টেনো-টাইপিষ্ট? এর একটাই উত্তর মনে আসছে, কবি ফটোগ্রাফার নন, আর্টিষ্ট। কবির সাধনা একলব্যের মতোই ঐকান্তিক। মানুষের মন থেকে মনের মানুষকে ছেঁকে তোলার অভ্যাসে ও চর্যায় কবি ভিন্ন অন্য কোনো সাহিত্যশাখার রচয়িতা পারবেন না—এমনতরো হটকারী মন্তব্য বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে মনে করিনে। তবে 'কবি' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে এক ধরণের প্রসন্ন অনুভূতি যেভাবে হৃদয়কে দুলিয়ে দেয়, আর কোনো শাখা থেকে তেমন মধুর আর্তি মেলে না।

আধুনিক কবিতা শুধু নৈঃসঙ্গের দীপ্তিতে উজ্জ্বল নয়, তা আত্মসমালোচার লালনে ভাস্বর। তবু দুঃখ জাগে, যখন দেখি ছন্দব্যাপারে অর্থহীন মাৎলামী ও পরস্পরের পৃষ্ঠকণ্ডুয়ন-নীতি। কবিতার ছন্দ কি হবে, কোন্‌ জাতীয়, কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত অধিক যোগ্য, এইসব তর্ক না করলে এ লেখা যে অসম্পূর্ণ থাকবে, তা মনে হয় না। ছন্দ নিয়ে দীর্ঘ নিবন্ধ কেন, গোটা বই লেখা যেতে পারে, কিন্তু সে দায়িত্ব শুধু তত্ত্বজ্ঞের নয়, কবিরও ওপর বর্তায়। তবে এখানে দু একটি সূত্র, যা এই মুহূর্তে, মনে আসছে, তা বলি। কবিতায় ছন্দ থাকবে, এ আর নোতুন কথা কি? কবিতা যে ঢং পাক না কেন তার নিহিত ছন্দসুষমা কখনোই মারা পড়ে না—আর, পড়লে তা কবিতা নয়। কবিতা বলে যাকে ভালোবাসছি, স্বেচ্ছাপরিচর্যায় জড়িয়ে ধরছি, তার মধ্যে কি কখনো স্পন্দনমান ছন্দচাঞ্চল্য পাই না? ফলে, কবিতায় যে মিলনান্তক ছন্দ ব্যবহারের কথা শ্রদ্ধাস্পদেরা বলে থাকেন, তার খুব একটা প্রয়োজনীয়তা আছে বলে বোধ করি না। তবু কি ছন্দে লেখার প্রস্তাব বাতিল করে দেব? নৈব নৈব চ। সমস্যাটার উৎস অন্যত্র। ইদানীং এই অভ্যাস বা দুষ্ট নেশা দেখতে পাই, সাদা কাগজ ও কালি-কলম পেলে কবিতা লেখার বাতিক যদি না জাগে, তবে তিনি বাঙালী নন এমন আশঙ্কায় কবিতা লিখতে বসেন। এইসব হুজুগবিলাসীদের কাছে ছন্দ

ব্যাপারটা অপাংতেয় বলে মনে হয়। যা জানিনা তার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে তৃপ্তি পান, এমন কবির সংখ্যা বিশেষত এই দশকে মহামারীর মতন, দেখতে পাচ্ছি। এইসব ভেবেই হয়ত কোনো কোনো অগ্রজপ্রতিম বলে থাকেন, প্রথমত ছন্দে চেষ্টা করতে না শিখলে ভালো গদ্য কবিতা তথা আধুনিক কবিতা লেখা সম্ভব নয়। তবে সামগ্রিক ভাবে, এর উল্টোদিকও আছে। প্রয়াস দেখা যায়, গদ্য কিম্বা সাদামাটা ভঙ্গিতে লেখা কথাশীর্ষক রচনা অনেক ক্ষেত্রেই কবিতার পংক্তিতে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। কিন্তু নিছক ছন্দোসর্বস্ব কথামালা কবিতার পোষাকী রূপ পেলেও আত্মিক চরিত্র পায় নি। ছন্দের উত্থান-পতনের নির্ভরতা শুধু উচ্চারণে নয়, বাকস্পন্দনে। আরেকটু বিস্তৃত জানাতে চাইলে বলতে হয় কবিতায় ছন্দের আকর্ষণ, শব্দব্যবহারের ক্ষিপ্রতায়, দীর্ঘায়িত বিন্যাসে কিম্বা স্বরগ্রাহ্য স্বরগ্রামের প্রসারে। শব্দনির্বাচনে কবিকে এ্যাকাডেমিক হ'লে চলবে না। তাঁকে উদারপন্থী হতে হবে। তবে ঔদার্যের পরিণাম কখনো বা কবিতাকে সেই দ্বীপান্তরে নিয়ে যায়, যেখানে পৌছে রসিক ও পরিশ্রমী পাঠক অর্জন করতে পারেন না কাব্যবক্তব্যের সামান্যতম রস। কিছুদিন আগে একটি কাব্য সংকলনে (A new American Anthology edited by Walter Lowenfels) এরকমই একটি দৃষ্টান্ত পেলুম জর্জ হাস্টন বাসের (জন্ম তারিখ ১৯৩০, যিনি Secretary and literary assistant to Langston Hughes.) 'Life Cycle in the Delta' কবিতায়। পাঠকের জন্যে সম্পূর্ণ কবিতাটি তুলে ধরছি,—

First Daddy
Then Mama
Then Me.

First Plant
Then chop
Then pick

PLANT!
CHOP!
PICK!

daddy
mama
me.

মেধাবী পাঠক হৃদয়বান পাঠক এই কবিতাটির অর্থোদ্ধার করতে থাকুন, আমি ততক্ষণে এগিয়ে যাই মৌল সূত্র ধ'রে,—শব্দ নির্বাচন এমনই হওয়া উচিত যা তথ্য দেবে না—জানাবে সত্য; চতুর কবিতা হিসেবে হয়ত 'life cycle in the delta' মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে, কারণ, চাতুর্যের দাম আজকাল শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি রূপে দেখতে পাচ্ছি। অথচ একই জিজ্ঞাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্বসূচী মালার্মের সাধনা অন্য জাতীয়। শব্দব্রহ্মের উপাসনায় নিবিষ্ট ধ্যানী এই অনন্যসাধারণ কবি মালার্মের পোয়েটিক ডিকসন আজ শিল্প প্রণয়নের এক অবিসংবাদিত দিক। তবুও মালার্মেও সর্বদা গ্রাহ্য কিনা, এ বিষয়ে তর্ক চলতে পারে। কবিতায় হৃদপিণ্ডের উত্তাপ ও অস্তিত্ব মেনে নিলে তা স্বাভাবিক ছন্দে দুলবেই। স্বাভাবিক ক্রমে কবিতার কথাশরীরে একরকমের সিম্ফনী সোচ্চার হয়ে উঠতে বাধ্য। সেই সূত্রে কোনো কোনো শব্দের প্রতি কবির দারুণ মোহ বা প্রশ্রয় জেগে থাকে। কিম্বা কোনো শব্দের অর্থব্যাপারে দারুণ ঘৃণা। কবিতায় এমনতরো ভাবনার ঔচিত্যবিষয়ক প্রশ্ন না তুলে এটুকু জানানো যায় কবিতায় মর্মের দোহনে যা রূপ পায় তা বড় নিবিড় বড় মধুর মগ্নতার উপমা। তথাপি কবিতা শব্দাকার ব'লেই সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে অর্থহীন স্তবক গড়ে কবিতার পোষ্টার আবাল- বৃদ্ধ-বণিতার মনে এঁটে দিতে হবে এমন সর্ত আরোপ করা উচিত নয়। কেন না শিল্প-সম্মত নয়। কবির লক্ষ্য হবে নোতুন কিছু দেওয়া। তিনি কতটুকু দিতে পারছেন তা বড় প্রশ্ন নয়। লক্ষণীয়, তাঁর ঐকান্তিকতার বহর কতটুকু। সম্ভাব্যতার ধোঁয়া না ছড়িয়ে বলতে পারি নোতুনত্ব মানে উদ্ভটত্ব নয়। কবিতার জগতে পাগল কবি, কবিতা-পাগল—প্রত্যেকের স্থান দেয়া চলে; কিন্তু কবিতা নিয়ে যারা উদ্দেশ্যমূলক পাগলামি করে সেই সব চতুর-চূড়ামণিদের প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্ন হোতে পারে না।

তবু ভাবলে দুঃখ জাগে, কবিতার ওপর আজ কী প্রচণ্ড মার এসে পড়ছে। ঔদ্ধত্যের নামই যদি সমালোচনরীতি হয়, তবে তা বর্জনীয়। সন্দেহ নয়, সন্দেহ পেরিয়ে কৌতূহল চাই। 'সম্পূর্ণতার স্পন্দন' না দেখে যদি 'অবলম্বন-

যোগ্য' শব্দার্থ খুঁজি কবিতায়, তবে তা সার্থকরূপে দেখা দেয় না। ভাসা-ভাসা বা একপেশে বিচার বা পর্যালোচনা পূর্ণানুভূতি কখনোই দিতে পারে না—চাই মূল্যবোধের সামগ্রিকতা—এবং আরো ঝকঝকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবনদর্শন এ ভাবেই অব্যর্থ হয়ে ওঠে ; এলিয়ট সাহেব বলেছেন—

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arive were we stated
And know the place for the first time.

কবিতার ঘরে ফেরার সাধনাই নয়, অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যের সেতুবন্ধনও চাই। আমরা তো আজো প্লটাইনাসের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

স্বীকার করি, কবিতার ইকনমিক দুঃসময়ের অস্বীকার। দুঃখের মধ্যে প্রিয়তমাকে চেনার যে আনন্দ মিলনের মধ্য দিয়ে সুখ ও সৌখীনতার আশ্রয়ে সে আনন্দ মেলে না। প্রাচীন কবির সুখেও আমরা এই কথাই শুনে এসেছি—

সংগমবিরহবিকল্পে বরমোঽপি বিরহোন সংগমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

কবিতাও দুর্যোগ ও বিরহের মধ্য দিয়ে হারিয়ে ফেরে পুনর্বার। কবিতা তাই আমাদের প্রাণের আবৃত্তিস্বরূপ, নিবিড়, আত্মার আত্মীয়। এজন্যেই বিরহ-দুঃখের এত মূল্যবান ভূমিকা। নানা প্রতিকূল প্রতিবেশের সঙ্গে লড়াই করে মার্জনা ক'রে কবি লেখেন কবিতা। সুঠাম ও স্বাস্থ্যবান অক্ষরে অক্ষরে ঝলসে ওঠে কবিতা। যদি বা ছলনার মানদণ্ড সম্মুখে বিভ্রম জাগায়—আমরা কবি, কবিতাপ্রেমিক, কবিতার অনুগ্রাহক কেউ-ই এড়িয়ে যাইনে, সে বিভ্রম মাড়িয়ে যেতে চাই। শুধু কি ভালোবাসার জোরে? না, ব্যাকুলতাও সাঙ্গ দেয়।

আমরা রক্তের নাম জীবন জেনেছি ব'লেই তো দুরন্ত দুঃখের দিনেও কবিতার রক্তাক্ত দর্পণে আত্মজিজ্ঞাসার মূল্যায়ন করতে করতে স্মরণ করি ঋক্ বেদের সেই উজ্জীবনী মন্ত্র—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ/মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ। এবং সেই সূক্তিপদ—চরৈবেতি চরৈবেতি অর্থাৎ চলো, চলো অনন্তের পথে ;—সর্বোপরি মৃত্যুর মুখোমুখি উপনিষদ-প্রত্যদেশীয় সংস্কৃতি ও তাপসী জিজ্ঞাসার নিত্য বর্তমান অনুভূতি রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি মনে জাগবে—

মাভৈঃ, আরো মুগ্ধ মায়ার সৌন্দর্য পূজারী, অসহ্য সুন্দর কীটস আছেন—মৃত্যু যাঁর কাছে এক উচ্চারিত অভিজ্ঞান—

অথচ আশ্চর্য, মাটির সংসারে ইতস্তত ভ্রাম্যমান মধুর নন্দন
দুঃখ তার হৃদিরত্ন শোভা ; তবু অকম্পিত
বুকে সে চলে একাকী, বন্ধুর দুর্গম পথে ; সংগ্রামী জীবন
দারুণ দুর্যোগে ব্যর্থ হ'লে সে নয় মরণ ; অবকাশ শেষে পুনর্বার
উজ্জীবনী চলা, নির্বারিত।

অর্থাৎ—কাব্য অনন্তকাল জাগ্রত রবে ; তাকে জাগ্রত রাখার দায়িত্ব এক-এক যুগে এক-এক দল কবির ; এভাবে মালাবদল। সূত্র এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু সূত্রধার বহু। সমালোচক, গঠনতন্ত্রী প্রজ্ঞাবান শুধোবেন —'কথমেতৎ? এ্যাণ্ড দেন? তারপর?' —তারোপর থাকবে বৈকী। কি থাকবে? —কাল নিরবধি! বিপুলা পৃথ্বী! —আর কিছু নয়?

আর—মৃত্যুঞ্জয়ী কবিতা ও কালের রাখাল।

পুনশ্চ॥ মনে যা যা এলো, লিপিবদ্ধ করে ফিরে বলছি! তারপর সূত্র পাঠান্তের ফলশ্রুতি হিসেবে আর যা যা মনে এলো তার একটা সংক্ষিপ্তসার জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে—

১। একালের কোনো কোনো কবিতারসিকের মতন আমিও মানি. কোন কবিকে যেমন 'অকেশনাল' হওয়া উচিত নয়, তেমনি কোনো কবিতা পাঠককে 'ক্যাজুয়াল' হলে চলবে না। উভয়পক্ষকেই পরিশ্রমী সহৃদয় হতে হবে।

২। কবি বলবেন না কখনোই, পাঠক প্রশ্ন করো নম্বর বসিয়ে আমি পাশ মার্কের মতন উত্তর দেব। কিম্বা কোনো পাঠক শুধোবেন না কবি, আমার প্রশ্নের উত্তর কই। আমি যা চাই, তা দিচ্ছ না কেন?

৩। পাঠকের কখনোই ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয় ; কবিতায় কবির কাছ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না পেলে। কেন না, সিদ্ধান্তপ্রিয়তা' কবির পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। কবির কবিতায় প্রশ্নবোধক উত্তর থাকে, যা জেগে উঠে পাঠকের মনে পুনর্বার জিজ্ঞাসায় এবং পুনর্বার প্রশ্নবোধক উত্তর পায় পাঠক। উভয়কেই তাই মনে রাখতে বলি. সেই সূত্র—A poem does not mean, but to be'

৪। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবীক্ষণমূলক একটি গ্রন্থ থেকে কোনো একটি উজ্জ্বল উপলব্ধি প্রসঙ্গ, যা তিনি জোগাড় করে তুলে ধরেছেন এইভাবে—উইলিয়াম জেমস্ ক্লাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের মনে যা আসত, তাই বকে যেতেন। একদিন ছাত্ররা জিজ্ঞেস করলে—What then, sir is your conclusion ? জেমস্ উত্তর দিলেন—conclusion ? Is the universe concluded that I should come to a conclnsion ?

এবার আমার বক্তব্য এই যে একজন দর্শনপ্রেমী সাহিত্যসেবী অধ্যাপকের কাছ থেকে এই উত্তর পেলে নিরন্তর নিরীক্ষাকারী চিরজিজ্ঞাসু কবির কাছ থেকে তথাকথিত সিদ্ধান্ত বা উত্তর পাওয়া সম্ভব কিনা বা গ্রন্থনাপ্রিয় পাঠক উত্তর চাইবেন কিনা, সেটুকু ভাববার ভার তাঁদের রইল।

রামশঙ্কর গিরি

কোথায় পালাস

মুঠো মুঠো উষার সোনালী গোধূলিতে ধূলো হয়ে গেছে
শেষ শহরের উপকণ্ঠে কোন কবি হেঁকে যায়

সুদূরে সায়াহ্নে
ভগ্না ভাগীরথী ভাটিয়ালী নৌকায়
কে তোরা কে তোরা কে তোরা গো
কোথায় পালাস।

সুতপা দত্তগুপ্ত

অনন্তের গল্প

পশ্চিমের জানালায় যে একখানি আকাশ দেখা যায়
আজ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে ; নিভে গেছে আলো।
চারদিক অন্ধকার। বুক ভ'রে নিঃশ্বাস পাওয়া
যাচ্ছে না। কষ্ট, বড় কষ্ট।
অথচ কালও খুলেছি ওই জানালা। ছিল নীল আকাশ।
ছিল পবিত্র হাওয়া। সুন্দর সূর্যের আলো। ছিল গোধূলির
সূর্যাস্তের সাতরং। রাতে একখানি চাঁদ, ক্রমশঃ পূর্ণ—
আর সেই নক্ষত্রেরা।
তাহলে কী ব্যবধান কাল ও কালান্তরে অথবা এই বর্তমান
এত গূঢ় !! গত উল্লাস—আনন্দ—বিশ্বাস, আজ মলিন
মসীবর্ণ, আঁধারে আত্মসমর্পিত।
বিচিত্র জীবন, যেমন আকাশ। অথচ অনন্তের সঙ্গী। আমি জানি
অভিমান যত গূঢ় হোক সময় নিরবধি। আকাশ ও পৃথিবীর
পরস্পর চেয়ে থাকা হবে না বিলীন—
হবে না কখনো মুখচুরী।

With Best Complements from—

M/s. **C. NARAYAN & Co.**

Stockists of : IRON CLAD SWITCHES
& SPAIR PARTS
Dealers in : ELECTRICAL GOODS
49, Ezra Street, Calcutta-1

ভারতের বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র হইতে সদ্য আমদানিকৃত
প্রসিদ্ধ ব্লাউজ, সায়া, বডিজ ইত্যাদির প্রচুর সমাবেশ

কালী বস্ত্রালয়

গভর্ণমেণ্ট স্টল নং ২৮।২৯
আপার সার্কুলার রোড, কলি-৬
(ছায়া সিনেমার বিপরীতে)
প্রোঃ স্বপনকুমার দাস

কবিতা পত্রিকা

অলক্তক পড়ুন

সম্পাদক—**মদনমোহন বিশ্বাস**
চুচুঁরা স্টেশন রোড, হুগলী

কবিতা সংকলন

অর্ফিয়ুস

সম্পাদিকা—**মমতা কোলে**
প্রথম সংকলন বেরুচ্ছে

সম্পাদনায় : **অভিজিৎ সরকার শুভঙ্কর ঘোষ**
সহ সম্পাদনায় : **গৌরাঙ্গসুন্দর দত্ত**
কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

অন্তর পর্ষদের পক্ষে অভিজিৎ সরকার কর্তৃক ৬৭/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও দেশবাণী মুদ্রণিকা প্রাঃ লিঃ, ১৪-সি, ডি, এল, রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : পঞ্চাশ পয়সা